Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 28 - 39
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 28 - 39
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা অণুগল্পের উদ্ভবের পটভূমি

সুমন সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়মঠ
Email ID: suman941998sarkar@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
অণুগল্প, তৈত্তরীয় উপনিষধ, লিপিকা, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগর, বিশ্ববঞ্চক ও বিশ্বভন্ড।

Abstract

বাংলা অণুগল্পের শুরু বৈদিক মন্ত্রে। তারপর উপনিষধের মন্ত্রে। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ এগুলোর মধ্যে অণুগল্পের সার্থক নমুনা প্রাপ্ত হয়েছে। ছাপাখানার যুগে সার্থক ভাবে বাংলা অণুগল্প এসেছে। গোলকনাথ বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এদের প্রয়াসে অনেক 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পে'- এর অনুবাদ হয়েছে। ফোর্টউইলিয়াম কলেজের পর বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকায় সাহিত্যের অন্যান্য সংরূপের পাশাপাশি বাংলা অণুগল্পের প্রকাশ করতে থাকলো। এই অণুগল্পগুলিকে শিশিরকুমার দাশ তার 'বাংলা ছোটগল্প' গ্রন্থে 'চূর্ণক' অভিধায় ভূষিত করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি সেই রকম কিছু 'চূর্ণক'-এর উদাহরণ দিয়েছেন। এগুলোকে তিনি চূর্ণক বললেও আদতে যে অণুগল্পের পূর্বজ রূপ সে বিষয়ে সংশয়ের লেশ মাত্র থাকতে পারেনা। এই সময় বাংলা পত্র-পত্রিকার জগতে 'সমাচার দর্পণ', 'উপদেশক পত্রিকা', 'বঙ্গমিহির', 'রহস্য সন্দর্ভ', 'পঞ্চানন্দ' ইত্যাদি পত্রিকা বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধনে লিপ্ত ছিল। এখানেই কিছু অণুগল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। এরপর স্বর্ণকুমারী দেবী কিছু অণুগল্প লেখেন। তারপর ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বাংলা অণুগল্পের জগৎকে সমৃদ্ধ করে। তবে পাকাপাকি ভাবে অণুগল্পের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'লিপিকা' গ্রন্থে। বাংলা ছোটগল্পের সার্থক রূপকার রবীন্দ্রনাথ বাংলা অণুগল্পকে তার সার্থক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অণুগল্পের পটভূমিটি নির্মাণ করেছিলেন। বাংলা অণুগল্প রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে যে পূর্ণতা পেয়েছিল তা পরবর্তীতে বনফুল তাকে আলাদা মাত্রা দান করেছিলেন। যদিও তার লেখা গল্পগুলিকে 'পোস্টকার্ড সাইজ গল্প' বলা হয়। এগুলো আদতে অণুগল্পই। তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথমদিককার সর্বাধিক অণুগল্পের শ্রষ্ঠা। তিনি কম-বেশি চারশত অণুগল্পের লেখক। এরপর অমিয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে অণুগল্পের পত্রিকা 'পত্রাণু' প্রকাশ হতে থাকলে অণুগল্পের জোয়ার শুরু হয়। এই সময় 'শ্রী', 'ঋতম', 'কুহু', 'চন্দ্রবিন্দু', 'মাইক্রো', 'মিনিষ্টার', 'এক্স' ইত্যাদি অণু পত্রিকা বের হতে থাকে। এই সব পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করতে থাকলেন বনফুল, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, মনোজ বসু, বিমল মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী,

সন্তোষ কুমার ঘোষ ইত্যাদি স্বনামধন্য লেখকেরা। এই ভাবে বাংলা অণুগল্পের পটভূমি প্রস্তুত হয়ে গেল।

Discussion

বাংলা অণুগল্প রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে প্রথম সার্থক ভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁর 'লিপিকা' গ্রন্থের লেখাগুলি অণুগল্পের নিদর্শন। যদিও তার লেখার বহুপূর্বে এই অণুগল্পের সম্ভাবনার বীজ প্রথিত ছিল প্রাচীন সাহিত্যিক নিদর্শনের মধ্যে। বৈদিক যুগের বিভিন্ন মন্ত্র-তন্ত্রের মধ্যে অণুগল্পের সম্ভাবনার বীজ খুঁজে পাওয়া যায়। বৈদিক মন্ত্রের 'ওঁ', 'হ্রীং', 'ক্লীং' ইত্যাদি শব্দের মধ্যে অর্থের ব্যাপক ব্যঞ্জনা আছে। এই শব্দগুলির মধ্যে দিয়ে বিরাট অর্থকে এক নিমেষে বুঝিয়ে দেওয়া যায়। ক্ষুদ্র কথার মধ্যে বৃহতের প্রকাশের নামই অণুগল্প। তাই এই শব্দগুলিকে অণুগল্পের পর্যায়ে অনায়াসে রাখা যায়। যদিও সেই সময় অণুগল্প নামটির প্রচলন ছিল না। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন সাহিত্য ভান্ডারে এই জাতীয় অনেক নমুনা পাওয়া যায়। এমনকি এই শব্দ সংখ্যার নিরিখে –

> "ওঁ সহ নাব্বতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহবীর্যং করবাবহৈ।/তেজস্বী নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।/ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"[১]

(ঈশ্বর আমাদের উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন। আমাদের উভয়কে পালন করুন। আমরা যেন সমান সামর্থ্যবান হই; অধীত বিদ্যা যেন আমাদের উভয়ের জীবনকেই তুল্যভাবে তেজদৃপ্ত হয়; আমরা পরস্পরকে যেন বিদ্বেষ না করি। আমাদের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক শান্তি হউক।) বা 'তৈত্তরীয় উপনিষধ' এর –

> "ওঁ শং মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা। শং ন
> 'ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে।
> নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং
> ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু।
> তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্।
> ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।"[২]

(সূর্য ও বরুণ আমাদের প্রতি সুখপ্রদ হোক, অর্যমা সুখকর হোক, ইন্দ্র ও বৃহস্পতি আনন্দপ্রদ হোক। বিস্তীর্ণ পাদক্ষেপনকারী বিষ্ণু আমাদের মঙ্গলকারী হোক। ব্রহ্মকে নমস্কার। বায়ুকে নমস্কার। হে বায়ু, তুমি প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপে বলিব। উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ঋত স্বরূপে বলব। সত্যস্বরূপে বলব। সেই ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন। আমার আচার্যকে রক্ষা করুন। ত্রিবিধ শান্তি হোক আমাদের জীবনে।)

বৈদিক মন্ত্রগুলিকে অণুসাহিত্য বলা যায়। অণুগল্প নাম না নিলেও আয়তনের ক্ষুদ্রতার কথা মাথায় রেখে এই বৈদিক সাহিত্যের নমুনাগুলিকে অণুগল্প-র সগোত্র বলা চলে। এরপর সংস্কৃত ভাষায় গুপ্তযুগে লেখা বিষ্ণু শর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থে অজস্র অণুগল্পের উৎস পাওয়া যায়। এই গ্রন্থটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। যথা - মিত্রভেদঃ, মিত্রসম্প্রাপ্তি, কাকোলূকীয়, লব্ধপ্রণাশ, অপরীক্ষিতকারিতং। 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থে প্রাপ্ত অণুগল্পগুলি হল- 'দমনক ও করটক নামে দুই শৃগাল', 'কাক, কেউটে ও সোনার হার', 'বক ও কাঁকড়া', 'কুমোরের যুদ্ধযাত্রা', 'বুদ্ধির জয়', 'সমুদ্র শাসন', 'বোকামির ফল', 'খাল কেটে কুমির আনা', 'গর্দভ রাগিনী', 'দুমুখো পাখী', 'পেচক রাজা' ইত্যাদি। নমুনা হিসাবে 'শেয়াল-শাবক ও সিংহ-শাবক' অণুগল্পটিকে দেখানো হল -

> "সিংহী ও সিংহ থাকত এক বনে। তাদের ছিল দুটি বাচ্চা। সকালে সিংহ শিকারে বেরিয়ে যায়। কোনো দিন নিয়ে আসে হরিণ, কোনো দিন খরগোস, ছাগল ও শুয়োর কত কিছু। এনে দেয় সিংহীর কাছে। তারপর বাচ্চা-দুটো নিয়ে এক সঙ্গে খায়। বড় কিছু পেলে কয়েকদিন চলে যায়। একদিন শিকারে বেরিয়ে সিংহ সারাদিন কিছুই পায়নি। শেষে পেল শেয়ালের একটি বাচ্চা। সিংহ সেটাকে মারল না। মুখে আলতো করে কামড়ে ধরে জ্যান্ত নিয়ে এল। সিঙ্গহীকে দিয়ে বলল, আজ অন্য কিছু পেলাম না। বাচ্চা বলে এটাকে মারতে পারিনি। তুমি যা করার করো। সিঙ্ঘী বলল তুমি যাকে মায়া করে মারতে পারলে না, আমি তাকে কোন প্রাণে মারি! ও থাকুক। আমাদের

> ছানাপোনাদের সঙ্গে মানুষ হোক। ওদের খেলার সাথী হবে। তারপর তার বাচ্চাদের ডেকে বলল, শোন আমার আদরের ছানাপোনারা, তোদের একটা ভাই এনেছে তোদের বাবা। তার সঙ্গে খেলবে-দেলবে। ভাইয়া ডাকবে। ...দিন কাটতে লাগল। দিনে দিনে সিংহীর ছানারা বড় হয়ে উঠল। ...বেড়িয়ে আসে। একদিন বেড়াতে গেছে ওরা। হঠাৎ সামনে পড়ল একটা হাতি। ইয়া বড় বড় কান, বড় দুটি দাঁত। শুঁড় দিয়ে টেনে গাছের ডাল ভেঙে পাতা খাচ্ছে। হাতি দেখে সিংহীর বাচ্চাদের সে কি তর্জন-গর্জন! থাবা বাগিয়ে দুজনে তাড়া করতে যায় আর কী!
> এত বড় প্রাণী দেখে শেয়ালের প্রান যায় যায়! সে ভাইদের থামিয়ে বলল, এত বড় হাতিকে তেড়ে যাচ্ছিস কী! মরবি যে! পালা শিগগির। এই বলে সে নিজেই সবার আগে চোঁ চোঁ দৌঁড়। দাদাকে পালিয়ে যেতে দেখে সিংহীর ছানাদের আর উৎসাহ রইল না। তারাও ছুটে গুহায় চলে এল। এসে মা-বাবার সামনে ভাইয়ার কীর্তি বলে খুব হাসতে লাগল। তা শুনে শেয়াল ছানা এই মারে তো এই মারে। সিংহী তাদের থামালো। তারপর শেয়াল ছানাকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল, বাছা ওরা তোমার ছোট ভাই, কী বলতে কী বলেছে, ওদের সঙ্গে ঝগড়া করতে আছে? ভায়ে-ভায়ে এমন করে না।
> রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে শেয়াল ছানা বলল, ওরা আমাকে নিয়ে এত হাসি-ঠাট্টা করবে কেন? ওদের ভালর জন্যই তো মানা করেছি। ওদের চেয়ে আমি কম কিসে? আমি ওদের চেয়ে দেখতে খারাপ, নাকি সাহস কম, না আমার গায়ে বল কম? আর আমি তো ওদের চেয়ে বড়। আমাকে মান্যি করবে না?
> সিংহী হেসে বলল, বাছা তোমার সাহস বল কোনটাই কম না। দেখতে তুমি খুব ভাল। তবে কী জানো, তুমি যে বংশে জন্মেছো সেখানে কেউ কোন দিন হাতি মারেনি। ...বাছা তুমি জন্মেছ শেয়ালের ঘরে। ...আমার দুই ছেলের কেও একথা জানে না। ...তোমার ব্যবহারে ওরা জেনে যাবে। তখন তারা তোমাকে মেরে ফেলবে। আর এসব কথা তুমি যখন জানতে পারলে, আজই পালিয়ে তোমার জাতের লোকদের কাছে চলে যাও।
> সিংহীর কথা শুনে শেয়ালছানা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। পরে ভয়ে ভয়ে গুহার বাইরে এসে দৌড়ে বনে উধাও হয়ে গেল। পেছনে একবার ফিরে তাকালো না।”[৩]

এছাড়াও প্রাচীন ‘হিতোপদেশ’, ‘কথাসরিৎসাগর’ ইত্যাদি গ্রন্থে অণুগল্পের কিছু উদাহরণ পাওয়া যায়। এই সাহিত্যিক নিদর্শনগুলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা। এইগুলির মধ্যে অণুগল্পের কিছু কিছু লক্ষণ পাওয়া যায়। ‘হিতোপদেশ’ গ্রন্থের ‘শিবা, মৃগ ও কাক কথা’, ‘ময়ূর রাজহংশ কথা’, ‘রজক রাসভ কথা’ ইত্যাদি অণুগল্পের পূর্বজ নমুনা।

বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন ‘চর্যাপদ’ পদ্যাকারে লেখা। প্রাক্‌আধুনিক বাংলা সাহিত্য ছিল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্তপদাবলী ও মঙ্গলকাব্যময়। এই সময়ের সাহিত্যে মহাকাব্য জাতীয় রচনা লেখবার প্রবণতাও দেখা দিয়েছিল। চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস বা গোবিন্দদাসেরা রাধা-কৃষ্ণের মর্ত্য প্রেমলীলাকে উপজীব্য করে বৈষ্ণব পদ লিখত। মঙ্গল কাব্যের কবিরা দৈবনির্দেশে ‘মনসামঙ্গল কাব্য’, ‘চন্ডীমঙ্গল কাব্য’, ‘শিবায়ন’, ‘অন্নদামঙ্গল’ ইত্যাদি আখ্যানধর্মী মঙ্গলকাব্য লিখত। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থগুলি মহাকাব্য জাতীয়। এই সময়ে বাংলা অণুগল্প গড়ে ওঠার কোন সুযোগ ছিলনা। প্রথমত, প্রথম অঙ্কুরিত বাংলা সাহিত্য কাব্যকে আশ্রয় করে গড়ে উঠছিল। দ্বিতীয়ত, এই সময় দেব-দেবতা কেন্দ্রিক স্তুতিমূলক প্রশস্তি রচনার প্রাবল্য ছিল অধিক। তৃতীয়ত, এই সময় সাহিত্যে গদ্যের আবির্ভাবই ঘটেনি। তাই বাংলা অণুগল্পের ক্ষেত্রে এই সময়কালকে অণুগল্পের খরার যুগ বলা যেতে পারে। তবে প্রাক্‌আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অণুগল্পের নজির না থাকলেও পূর্বজ সংস্কৃত ভাষায় অণুগল্পের আদি উৎস খুঁজে পেয়েছি। যা ইতিপূর্বে আলোচনায় এসেছে। অণুগল্প এসেছে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনা লগ্নেই। বিশেষ করে ফোর্টউইলিয়াম কলেজের উদ্যোগে যখন বিদেশি বা স্বদেশি অন্যভাষার সাহিত্যের বাংলা অনুবাদ শুরু হল তখন থেকেই বাংলা অণুগল্পের নমুনা চোখে পড়তে শুরু করল।

বাংলা ছাপাখানার যুগে উইলিয়াম কেরি, গোলকনাথ বসু, হরপ্রসাদ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার প্রমুখ সাহিত্যিকেরা অনুবাদ, প্রাচীন কাহিনির সংগ্রহ আবার নিজস্ব প্রয়াসে সাহিত্য উদ্ভাবন করছেন। এই সময় বাংলায় অনেক ‘ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প’ - এর প্রকাশ হতে থাকে। বাংলা ভাষা ফোর্টউইলিয়াম কলেজের পন্ডিতদের দ্বারা চর্চার কারণে সাহিত্যগত ভাবে সমৃদ্ধও হতে থাকে। গোলোকনাথ বসুর ‘হিতোপদেশ’ কিমবা হরপ্রসাদ রায়ের ‘পুরুষ পরীক্ষা’, বিদ্যাসাগরের ‘বেতালপঞ্চবিংশতি’, চন্ডীচরণ মুন্সির ফারসি অনুবাদ ‘তোতা ইতিহাস’, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 28 - 39
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

‘প্রবোধচন্দ্রিকা’ ইত্যাদি সেই সময়ের সাহিত্যিক নিদর্শন। এই অনূদিত রচনাগুলিতে কিছু কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুগল্পের নজির চোখে পড়ে। যেমন - ‘বিশ্ববঞ্চক ও বিশ্বভন্ড’ অণুগল্পটি -

> “ভোজপুরের বিশ্ববঞ্চক নামে একজন থাকে, তাহার ভার্যার নাম গতিক্রিয়া, পুত্রের নাম ঠক। এই অপূর্ব সংসারের কর্তা বিশ্ববঞ্চকের কাজ লোক প্রতারণা। সে একটি ঘটে ছাই-ধুলো ইত্যাদি ভর্তি ক’রে ওপ্রে এক-আধ সের ঘি দিয়ে ঢেকে দেয়। তারপর সমস্তটি ঘির ঘট বলে বিক্রি করে দেয়। বিশ্বভন্ড নামে আরেক ব্যক্তি সেও এক গুড়ের কলসিতে কাদা ভরে ওপরে কিছুটা গুড় নিয়ে ঘোরে। একদিন বিশ্ববঞ্চক ঘির ঘট গাছ তলায় রেখে স্নানে গেছে। বিশ্বভন্ড দেখল সেখানে কেও নেই। ভাবল কত আর গুড়ের কলসি মাথায় ঘুরি। এই ভেবে ঘৃতকলসি নিয়ে আনন্দিত মনে পালাল। বিশ্ববঞ্চক সেই কলসি মাথায় তুলে নিল ও বাড়িতে ফিরে ‘আপন স্ত্রীকে ডাকিল, ও ঠকের মা, ওরে দৌড়িয়া শীঘ্র আয়, মাথা হইতে ভার নামা, আজি এক ব্যাটাকে বড় ঠকাইয়াছি ...। এক ব্যাটা লক্ষী ছাড়া আপন এই গুড় ফেলাইয়া আমার সেই ঘি এর ঘড়া জানিস্‌ তো তাহা নিয়া অমনি প্রস্থান করিয়াছে। মনে মনে বড় হর্ষ হইয়াছে যে আজি যথেষ্ট ঘৃত পাইলাম, পশ্চাৎ টের পাইবে। যা শীঘ্র রাঁধাবাড়া কর, আমি নাইয়াই আসিয়াছি, ক্ষুধাতে পেট জ্বলিতেছে।’ স্ত্রী চটে উঠল, ‘তেল নাই, লুন নাই, চাউল নাই।’ শেষ পর্যন্ত ঘরে খুদ পাওয়া গেল। কিন্তু নুন নেই, তেল নেই। তখন ঠক গেল নুন আনতে। ঠক বাপকো বেটা। ‘তৎপিতা জিজ্ঞাসিল, কিরূপে তৈল লবণ আনিলি? ঠক কহিল, এক ছোঁড়াকে ভুলাইয়া বন্ধপক দিয়া মুদি শালাকে ঠকাইয়া আনিলাম’। পিতাপুত্রে যখন এইরকম কথাবার্তা হচ্ছে তখন গতিক্রিয়া এসে জানাল যে ‘গুড় ঢালিতে প[রথম খানিক হুড় পড়িয়া তদুপরি এককালে কতকগুলো পঞ্চকর্দম পড়িল’। বিশ্ববঞ্চক মাথায় হাত দিল। কিন্তু বুঝল যে এই তার যোগ্য বন্ধু। যথা সময়ে দুজনের বন্ধুত্ব হল এবং দুজনে মিলে এক জায়গায় বাণিজ্য করতে গেল। সেখানে এক বণিকের কাছ থেকে একলক্ষ টাকা ধার করল। বিশ্ববঞ্চক সেই টাকা মেরে দেবার মতলব আঁটতে লাগল। দুই বন্ধু মিলে প্রস্তাব করল যে ছোট একটা ঘর করে তার মধ্যে কয়েক হাজার টাকার তূলা কিনে আগুন লাগাও। তারপর বণিকপকে বলল যে আমার সব টাকা পুড়ে গেছে। কিন্তু তোমার আমার সঙ্গে লোক দাও, আমি বাড়ি গিয়ে দিয়ে দোব। তারপর মহাজন যখন লোক দেবে তখন মধ্যপথে বিশ্ববঞ্চক চলে যাবে আর বিশ্বভন্ড পাগলের মত ‘ভূ ভূ’ শব্দ করবে। তখন বিরক্ত হয়ে মহাজনের লোক চলে যাবে আর বিশ্বভন্ড পাগলের মত ‘ভূ ভূ’ শব্দ করবে। তখন বিরক্ত হয়ে মহাজনের লোক চলে যাবে। তারপর দুই বন্ধু সেই লক্ষ টাকা ভাগ করে নেবে। তাই হল। বিশ্ববঞ্চকের ‘ভূ ভূ’ শুনে মহাজনের লোকেরা চলে গেল। তখন বিশ্ববঞ্চক এল বিস্বভন্ডের কাছে- ‘মহাজন বেটাকে কেমন ফাঁকি দিলাম, এক্ষণে আমার ভাগ দেও। ইহা শড়ুনিয়া বিশ্বভন্ড পূর্ববৎ পাগল হইয়া ‘ভূ ভূ’ কেবল ইহাই কহিল। পরে বিশ্ববঞ্চক কহিল, যাও যাও ভাই আমার সহিত কৌঈতুক করার কার্য নাই।”[৪]

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রকাশ করেন ‘বোধোদয়’, ‘বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ’, ‘কথামালা’, ‘নীতিবোধ’ গ্রন্থগুলি। এখানেই অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনীর উদাহরণ পাওয়া যায়। তাঁর হাতেই প্রকৃষ্ট রূপে অণুগল্পের অজস্র রচনাগুলি পাওয়া গেল। তার রচিত ‘বোধোদয়’ গ্রন্থে ‘পদার্থ’, ‘ঈশ্বর’, ‘ইন্দ্রিয়’, ‘চক্ষু’, ‘কর্ণ’, ‘নাসিকা’, ‘জিহ্বা’, ‘ত্বক’, ‘বর্ণ’, ‘স্বর্ণ’, ‘রৌপ্য’, ‘পারদ’, ‘হীরক’, ‘কাঁচ’ ইত্যাদি ছোট ছোট অণুগল্পের নমুনা পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ‘পদার্থ’ লেখাটি উদাহরণ হিসাবে দেখান হল -

> “আমরা ইতস্তত যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, সে সমুদয়কে পদার্থ বলে। পদার্থ ত্রিবিধ; চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ। যে সকল বস্তুর জীবন আছে এবং ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারে, উহারা চেতন পদার্থ; যেমন মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি; যে সকল বস্তুর জীবন নাই, সেখানে রাখ, সেইখানে থাকে, একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারেনা, উহাদিগকে অচেতন পদার্থ কহে; যেমন ধাতু, প্রস্তর, মৃত্তিকা ইত্যাদি। আর যে সকল বস্তু ভূমিতে জন্মে, উহারা উদ্ভিদ পদার্থ; যেমন - তরু, লতা, তৃণ ইত্যাদি।”[৫]

তার রচিত ‘বর্ণপরিচয়’ (দ্বিতীয় ভাগ) ‘প্রথম পাঠ’, ‘দ্বিতীয় পাঠ’, ‘তৃতীয় পাঠ’ (সুশীল বালক), ‘চতুর্থ পাঠ’ (যাদব), ‘পঞ্চম পাঠ’ (নবীন)। এখানেও অণুগল্পের কিছু নমুনা পাওয়া যায়। উদাহরণ –

> “শ্রম না করিলে, লেখাপড়া হয় না, যে শ্রম করে, সেই লেখা পড়া শিখিতে পারে। শ্রম কর, তুমিও লেখা পড়া শিখিতে পারিবে।”[৬]

‘তৃতীয় পাঠ’ (সুশীল বালক) উদাহরণ –

> "সুশীল বালক পিতা-মাতাকে অতিশয় ভালোবাসে। তাঁহারা যে উপদেশ দেন, তাহা মনে করিয়া রাখে, কখনও ভুলিয়া যায় না। তাঁহারা যখন যে কাজ করিতে বলেন, সত্বর তাহা করে, যে কাজ করিতে নিষেধ করেন, কদাচ তাহা করে না।"[৭]

বিদ্যাসাগরের 'কথামালা'য় 'বাঘ ও বক', 'দাঁড়কাক ও ময়ুরপুচ্ছ', 'শিকারী কুকুর', 'অশ্ব ও অশ্বপাল', 'সর্প ও কৃষক', 'কুকুর ও প্রতিবিম্ব', 'ব্যাঘ্র ও মেষপালক', 'মাছি ও মধুর কলসি', 'পিতামাতা', 'সুরেন্দ্র', 'চুরি করা কদাচ উচিৎ নয়', 'কৃষক ও সারস', 'সিংহ ও ইঁদুর', 'খরগোস ও কচ্ছপ' ইত্যাদি অজস্র অণুগল্পের নমুনা পাওয়া যায়। এই সময় মানুষকে পড়াশোনার প্রতি মনোনিবেশ ও স্বল্প পরিসরে জ্ঞান চর্চার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী লেখবার প্রবণতা ছিল।

ফোর্টউইলিয়াম কলেজের পর বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকায় সাহিত্যের অন্যান্য সংরূপের পাশাপাশি বাংলা অণুগল্পের প্রকাশ করতে থাকল। এই অণুগল্পগুলিকে শিশিরকুমার দাশ তার 'বাংলা ছোটগল্প' গ্রন্থে 'চূর্ণক' অভিধায় ভূষিত করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি সেই রকম কিছু 'চূর্ণক' - এর উদাহরণ দিয়েছেন। এগুলোকে তিনি চূর্ণক বললেও আদতে যে অণুগল্পের পূর্বজ রূপ সে বিষয়ে সংশয়ের লেশ মাত্র থাকতে পারেনা। এই সময় বাংলা পত্র-পত্রিকার জগতে 'সমাচার দর্পণ', 'উপদেশক পত্রিকা', 'বঙ্গমিহির', 'রহস্য সন্দর্ভ', 'পঞ্চানন্দ' ইত্যাদি পত্রিকা বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধনে লিপ্ত ছিল। এখানেই কিছু অণুগল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত অণুগল্পের উদাহরণ দেওয়া হল -

'উপদেশক পত্রিকা'য় প্রকাশিত অণুগল্পগুলি হল - 'দয়ালু বালক', 'এক রাখাল ও দুই মেষ - লালচাঁদ নাথ', 'প্রেম করাইবার বিপরীত উপায়', 'আতিথ্যে ব্যবহারের ফল', 'শত্রুর নিন্দা নিস্ফল', বড়পাগল, 'দুই ছবি' (১৮৫২) খ্রিঃ-এ প্রকাশিত হয় এই বাংলা অণুগল্পগুলি। ১৮৫৩ সালে 'দরিদ্রের প্রতি দয়া' ও আশ্চর্য পণরক্ষা' অণুগল্প দুটি বের হয়। ১২৮০ বঙ্গাব্দে 'উৎকৃষ্ট উপঢৌকন' ও 'মাতৃভক্তি' প্রকাশিত হয়।

'দিগদর্শন পত্রিকা'য় ১৮১৮ সালে 'অবিদ্যা ভূ অথবা ধনের অনিত্যতা' ও 'নিত্যকর্মের ফল' অণুগল্পের প্রকাশ হয়। 'বঙ্গমিহির' পত্রিকায় ১২৮০ সালে 'পাকা আঁব', 'প্রেমপাখ্যান', 'ঋণ পরিশোধ', 'ঠাকুর দাদার গল্প', 'সৌদামিনী' ইত্যাদি অণুগল্পের প্রকাশ হয়। 'প্রবোধচন্দ্রিকায়' 'অন্ধগোলাঙ্গুলন্যায়' অণুগল্পের প্রকাশ হয়।

বাংলা সাময়িক পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত অণুগল্পের একটি উদাহরণ দেওয়া হল-

> "একজন সেনাপতি অতি তুমুল যুদ্ধ সময়ে আপনার মুসাহেবের নিকট একটিপ নস্য প্রার্থনা করাতে মুসাহেব যে ক্ষণে তাঁহাকে নাসদানি দিলেন সেই ক্ষণেই একটা গলার বেগেতে তিনি কোথায় উড়িয়া গেলেন তাহাতে সেনাপতি কিছুমাত্র বিকৃত না হইয়া অন্য দিকে ফিরিয়া আর একজন মুসাহেবকে কহিলেন যে আপনার একটিপ নস্য আমাকে দিতে হইবে। নাসদানিটা ইহার সঙ্গে গিয়াছে।"[৮]

'বিবিধার্ত সংগ্রহ' পত্রিকায় প্রকাশিত অণুগল্পের উদাহরণ-

> "কেহ আপন সখাকে প্রাতঃকালে নিদ্রিত দেখিয়া কহিলেনঃ বন্ধো তুমি কি নিদ্রিত আছ। শয্যাস্থ ব্যক্তি কহিলেন 'কেন'। সখা প্রার্থনা করিলেন, আমার একটা টাকার প্রয়োজন হইয়াছে, যদি তুমি জাগ্রত থাক তবে উঠিয়া আমায় তাহা কর্জ দিলে ভাল হয়। সে কহিল 'তবে আমি ঘুমুচ্ছি।"[৯]

'উপদেশক পত্রিকা'য় প্রকাশিত বাংলা অণুগল্পের নমুনা -

> "কোন দিন এক রাজা অশ্বে চড়িয়া আপনার এক অশ্বারূঢ় দাসকে সঙ্গে লইয়া উদ্যানে বেড়াইতে গেলে দেখিলেন, কিঞ্চিৎ দূরে দুই মনুষ্য তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া ঝোপের মধ্যে লুকাইতে যায়। তাহাতে তিনি আপন দাসকে কহিলেন, তুমি শীঘ্র গিয়া ওই লোকদিগকে ধরিয়া আমার কাছে আন। তাহাতে সে গিয়া অবিলম্বে দুইজন ভিক্ষুককে আনিলে রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কেন লুকাইতে গিয়াছিলে? তাহারা উত্তর করিল, আমরা আপনার সাক্ষাতে ভীত হইয়াছিলাম। এইরূপ উত্তর শ্রবণে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া চাবুকে ভয়ানক রূপে প্রহার করিলেন, আমাকে ভয় করা তোমাদের অনুচিত, প্রেম করা উচিত। প্রেম করাইবার বিপরীত উপায়।"[১০]

শিশিরকুমার দাশ এগুলোকে 'চূর্ণক' বলেছেন। তাঁর কথায় - একটি ছোট ঘটনা, কিংবা অতি ছোট কথা যেন হঠাৎ জ্বলে ওঠে। স্ফুলিঙ্গ জ্বলে, সঙ্গে সঙ্গে আবার নিভে যায়। আগাগোড়া নিটোল এবং পূর্বকল্পিত। এগুলোই পরবর্তীকালের লেখকদের কাছে অণুগল্পের আদি উৎস হিসাবে পথ প্রদর্শক রূপে কাজ করেছে।

এই ভাবে বাংলা অণুগল্প সাহিত্যের আঙিনায় ধীরে ধীরে তার বীজটি বপন হয়েছে সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টায়। এরপর উনিশ শতককে বাংলা ছোটগল্পের আবির্ভাব কাল বলা হয়। এই সময় সাহিত্যিকেরা নতুন করে অণুগল্প লেখার চেয়ে ছোটগল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল সর্বাধিক। এর নেপথ্যে লেখকদের উদাসীনতার চেয়ে সমসাময়িক পত্রিকাগুলির দাবি অধিক দায়ি ছিল। 'কল্পনা' পত্রিকা, 'সখা' পত্রিকা, 'হিতবাদী' পত্রিকা, 'বালক', 'ভারতী' ইত্যাদি পত্রিকাগুলিতে ছোটগল্প ও উপন্যাস লেখানোর তাগিদ সর্বাধিক ছিল। এই মাঝের সময়কালটা বাংলা ছোটগল্পের প্রস্তুতি পর্বের সময়কাল। তাই এই সময় লেখকদের কলমে তেমন ভাবে অণুগল্পের চর্চার নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই সময় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কিমবা স্বর্ণকুমারিদেবীরা বাংলা ছোটগল্পের ভিত্তিপ্রস্তর নির্মাণ করছেন। তবে এই সময়ের মধ্যে কিছু কিছু অণুগল্প খুঁজে পাওয়া যায়। লেখিকা স্বর্ণকুমারিদেবী কিছু কিছু 'ক্ষুদ্র কথা', 'ক্ষুদ্রগল্প' ইত্যাদি নামে অণুগল্প লিখেছেন। তার 'কুমার ভীমসিংহ', 'অশ্ব ও তরকারি', 'প্রতিশোধ', 'কেন', 'গহনা' ইত্যাদি 'ক্ষুদ্রকথা' এই সময়ে প্রকাশিত হয়। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য-

> "উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকের পত্রিকায় 'গল্প', 'ক্ষুদ্রগল্প', 'ক্ষুদ্রকথা' প্রভৃতি নানা নামাঙ্কিত গল্পের আবির্ভাব হয়েছিল। ... স্বর্ণকুমারী তাঁর গল্পগ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন 'নবকাহিনী বা ছোটছোট গল্প।' এই নামটি তাৎপর্যপূর্ণ।"[১১]

উনিশ শতকে বাংলা ছোটগল্পের যেসময় ভিত্তি নির্মান হচ্ছে ঠিক সেই সময় লেখিকা অণুগল্পের সাক্ষর রেখে গেলেন। নামকরণে তারতম্য থাকলেও আদতে অণুগল্পই নির্মাণ করেছিলেন। এই সময়ের আরেক কীর্তিমান লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের হাতেও অণুগল্প বেরিয়েছে। তার 'মাধবের অপমান' লেখাটি একটি অণুগল্প। সংখ্যার নিরিখে বিচার করলে তিনি বরং বাংলা অণুগল্পের পাঠকদের হতাশ করেছেন। তার 'মাধবের অপমান' অণুগল্পটি উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হল -"গল্পটি বলিতে কিনুও অনুরোধ করিলেন। কিছুক্ষণ সাধ্য-সাধনার পর ছকু বলিতে আরম্ভ করিলেন। ছকু বলিলেন, - 'চক্রধর রায় মহাশয়ের কন্যাকে আমি বিবাহ করিয়াছিলাম। রায় মহাশয় টাকা ধার দিয়ে কখনও এক পয়সা সুদ না ছাড়িইয়ে, লকের বাড়ি চাঁধা রাখিয়া, তাহার পর তাহাদের ভদ্রাসন বেচিয়া ধনবান্ হইয়াছিলেন। রাঘব হালদার নামে একজন বড় মানুষের ছেলে বদ-খেয়ালীতে সমুদয় বিষয় নষ্ট করিয়া রায় মহাশয়ের নিকট আপনার বাড়ি বাঁধারাখিয়া ছিল। তাহার পর সে জাল জুয়াচুরি আরম্ভ করিল। কাবুলী চাকর রাখিয়া তাহাদেরে দ্বারা সে ডাকাইতি করাইত। অবশেষে জাল করার অপরাধে তাহার দ্বীপান্তর হইল। আমার শ্বশুর মহাশয় তাহার বাড়ি অতি অল্প মূল্যে কিনিয়া লইলেন। কলিকাতা শহরের উত্তর ধারে বৃহৎ বাড়ি, অনেক জমি চারিদিকে বাগান, প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। আমি সেই শ্বশুর বাড়িতে থাকিতাম।

কিনু জিজ্ঞাসা করিলেন- "তোমার পত্নী বিয়োগ হইলেও?

ছকু উত্তর করিলেন - হাঁ ভাই পত্নী বিয়োগ হইলেও কিছু দিন আমি সে স্থানে ছিলাম। কিন্তু আমার পক্ষে সে এক প্রকার নরক ভোগ হইয়াছিল। শ্বশুরের রাগে আর শাশুড়ীঠাকুরানীর গঞ্জনায় প্রাণ আমার অস্থির হইয়াছিল। শাশুড়ী ঠাকুরানীর জঞ্জনায় আমার প্রাণ অস্থির হইয়াছিল। শাশুড়ী ঠাকুরানী পরমরূপবতী ছিলেন।

নবদ্বীপ জিজ্ঞাসা করিলেন- 'তোমার স্ত্রী, তাঁ কি প্রকার রূপ ছিল?

ছকু উত্তর করিলেন- 'সে কথা কি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়? কেমন গর্ভে জন্ম। রঙ কিন্তু একটু কালো ছিল। চক্চকে কালো, বার্ণিস জুতার মতো। সম্মুখে দিয়া চলিয়া গেলে মনে হইত যেন কালো বিজলী খেলিয়া গেল।

বদন জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার পর?

ছকু বলিলেন- 'আমাদের শ্বশুরদের পাড়ার মাধব নামে এক জন ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নানা বিদ্যা শিখিয়াছিলেন। বিলাতি ধরণে, তিনি ভূত নামাইতে পারিতেন, গায়ে হাত বুলাইয়া তিনি রোগ ভাল করিতেন। আর সেই বিলাতি ভেলকী- যাহাকে হিপনটিশ্যাম বলে, তাহাও তিনি জানিতেন!

নবদ্বীপ একটি ইংরেজি জানিতেন। তিনি বলিলেন, হিপনটিসম (Hypnotism)

তাহার পর?

ছকু বলিলেন,- 'আমার স্বসুর মহাশয় হাঁহাকে এক-ঘরে করিলেন। কিন্তু কলিকাতায় কে কাহাকে এক ঘরে করিতে পারে? অনেকে তাহার পক্ষে হইল আমার শ্বশুরেরে আরো রাগ হইল। কিসে তাহাকে জব্দ করিবেন, সর্বদা সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্বশুরের প্রিয়পাত্র হইবার নিমিত্ত আমি এক উপায় স্থির করিলাম। শ্বশুর প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব করেন। অনেককে নিমন্ত্রণ করেন। সক্লের কান মলিয়া প্রণামী আদায় করেন। পূজা করিয়া বিলক্ষণ

> দুপয়সা তিনি উপার্জন করিতেন। যে যেমন প্রণামী দিত তারও সেইরূপ আদর হইত। এক টাকার কম প্রণামী দিলে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে তিনি একটি নারকেল নাড়ুও দিতেন না। শ্বশুরের সহিত পরামর্শ করিয়া পূজার স্ময় মাধবকে আমি নিমন্ত্রণ করিলাম। মাধব দুই টাকা প্রণামী দিলেন। পাড়ার অন্যান্য ব্রাহ্মণের সহিত তাহাকে ভোজনে বসাইলাম। এমন সময় সেই স্থানে শ্বসুর মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের সম্মুখে একটু দূরে ধপ করিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর মাধবের দিকে লক্ষ করিয়া তিনি বলিলেন,- 'ও কে? ও যে বড় ব্রাহ্মণের সহিত বসিয়াছে! ওর জাত গিয়াছে! তুমি এখনি উঠিয়া যাও'।
> মাধব বলিলেন,- 'তবে আমায় নিমিন্ত্রণ করিয়াছেন কেন?'
> কান খুঁটিতে খুঁটিতে শ্বশুর বলিলেন, - 'কি বলিলেন?'
> মাধব পুনরায় বলিলেন, - 'তবে আমায় নিমিন্ত্রণ করিয়াছেন কেন?
> শ্বশুর জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাকে কে নিমন্ত্রণ করিয়াছে?
> মাধব উত্তর করিলেন-'আপনার জামাতা'।
> শ্বশুর বলিলেন, 'মাথা নেই তার বার মাথা ব্যথা। আমার কন্যা কোথায় যে আমার জামাতা! এখনি উঠিয়া যাও, নতুবা গলা ধাক্কা দিয়া তাড়াইব'। দুই চারিজন ব্যতিত তাহার সহিত সমুদয় ব্রাহ্মন উথিয়া গেলেন। যাইবার সময় মাধব বলিয়া গেলেন, 'যদি বিদ্যা বল থাকে, তাহা হইলে শীঘ্রই আপনি ইহার প্রতিফল পাইবেন।"[১২]

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের পর বাংলা অণুগল্পের জগতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছেন। তিনি একাধারে বিশ্বকবি, ছোটগল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতকার ও সুরকার। তিনি সাহিত্যের সব বিষয়ে তার কলমটিকে স্পর্শ করেছিলেন সার্থক ভাবে। অণুগল্পের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। 'লিপিকা'য় ১৩২৯ বঃ (অগস্ট ১৯২২) যে সব লেখাগুলি প্রকাশ করলেন তা পরবর্তীকালে অণুগল্প বলে বিবেচিত হল। তিনি লিপিকা প্রকাশ কালেই তার লেখাগুলির জাত নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন সুহৃদ প্রমথ চৌধুরীকে। সেখানে তিনি-

> "প্রমথ চৌধুরীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিপিকার 'ছোট ছোট গল্প' গুলির জন্য বিকল্প দুটি নাম প্রস্তাব করেন। একটি হচ্ছে 'কথিকা', আর একটি গল্পস্বল্প' ... আমাদের প্রস্তাব গল্পগুচ্ছের গল্প যদি 'ছোটগল্প' হয়, তবে লিপিকার গল্প হোক 'ছোট্টগল্প'"[১৩]

আবার অপর একটি চিঠিতে জানান, -

> "আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি আর কিছু না করে ছোট ছোট গল্প লিখতে বসি তাহলে কতকটা মনের সুখে থাকি।"[১৪]

কাজেই বোঝা যাচ্ছে তিনি ছোটগল্পের চেয়ে আয়তনে আরো ক্ষুদ্র গল্প লিখতে চেয়েছিলেন। 'লিপিকা'য় প্রকাশিত অণুগল্পগুলির নাম হল - 'তোতাকাহিনী' (মাঘ ১৩২৪), 'কর্তারভূত' (শ্রাবণ ১৩২৬), 'অস্পষ্ট' (শ্রাবণ ১৩২৬), 'বাণী' (ভাদ্র ১৩২৬), 'পায়ে চলার পথ' (আশ্বিন ১৩২৬), 'প্রশ্ন' (আশ্বিন ১৩২৬), 'পুরনো বাড়ি' (আশ্বিন ১৩২৬), 'আগমনী' (মহালয়া, ১৩২৬), 'মেঘদূত' (কার্তিক ১৩২৬), 'কৃতজ্ঞ শোক' (কার্তিক ১৩২৬), 'সতেরো বছর' (কার্তিক ১৩২৬), 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' (কার্তিক ১৩২৬), 'একটি চাউনি' (অগ্রহায়ণ ১৩২৬), 'একটি দিন' (অগ্রহায়ণ ১৩২৬), 'গলি' (অগ্রহায়ণ ১৩২৬), 'সওগাত' (পৌষ ১৩২৬), 'মুক্তি (পৌষ ১৩২৬), 'প্রাণমন' (ফাল্গুন ১৩২৬), 'গল্প' (প্রবাসী ১৩২৬), 'রথযাত্রা' (বৈশাখ ১৩২৭), 'কথিকা' (বৈশাখ ১৩২৭), 'সুয়োরানীর সাধ' (আশ্বিন ১৩২৭), 'নতুন পুতুল' (ভাদ্র ১৩২৮), 'নামের খেলা' (ভাদ্র ১৩২৮), 'পট' (ভাদ্র ১৩২৮), 'রাজপুত্তুর' (আশ্বিন ১৩২৮), 'ভুল স্বর্গ' (কার্তিক ১৩২৮), 'মীনু' (কার্তিক ১৩২৮), 'সিদ্ধি' (মাঘ-ফাল্গুন ১৩২৮), 'বিদূষক' (বৈশাখ ১৩২৯)। গ্রন্থের সামগ্রিক রচনা ১৩২৪ বঃ থেকে ১৩২৯ বঃ -এ রচিত। যদিও 'লিপিকা'র অনেক পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অণুগল্প লিখেছিলেন। 'উলুখড়ের বিপদ' তার প্রথম অণুগল্পের সাফল্যমূলক পরীক্ষা। এপ্রসঙ্গে গোপিকানাথ রায়চৌধুরী মন্তব্য করেন –

> "ছোটগল্পের আয়তন নিয়ে যেন এক নতুন নিরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করলেন রবীন্দ্রনাথ। একাধিক্রমে আটটা গল্প লিখলেন, যেগুলির আয়তন দেড় থেকে দুই, তিন, বরজোর চার পৃষ্ঠা। সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত -উলুখড়ের বিপদ। মাত্র দেড় পৃষ্ঠার।"[১৫]

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জানান,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 28 - 39
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "এক এক সময় মনে হয় আমি ছোট ছোট গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারিনে- লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়।"[১৬]

নমুনা হিসাবে 'উলুখড়ের বিপদ' অণুগল্পটি দেওয়া হল –

> "বাবুদের নায়েব গিরিশ বসুর অন্তঃপুরে প্যারী বলিয়া একটি নূতন দাসী নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার বয়স অল্প; চরিত্র ভালো। দূর বিদেশ হইতে আসিয়া কিছুদিন কাজ করার পরেই একদিন সে বৃদ্ধ নায়েবের অনুরাগ দৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্য গৃহিণীর নিকট কাঁদিয়া গিয়া পড়িল। গৃহিণী কহিলেন, 'বাছা, তুমি অন্য কোথাও যাও; তুমি ভালমানুষের মেয়ে, এখনে থাকিলে তোমার সুবিধা হইবে না।' বলিয়া গোপনে কিছু অর্থ দিইয়া বিদায় করিয়া দিলেন।
>
> কিন্তু পালানোর সহজ ব্যাপার নহে, হাতে পথ-খরচা সামান্য, সেইজন্যে প্যারী গ্রামে হরিহর ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকটে গিয়া আশ্রয় লইল। বিবেচক ছেলেরা কহিল, 'বাবা, কেন বিপদ ঘরে আনিতেছেন'। হরিহর কহিলেন, 'বিপদ স্বয়ং আসিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তাহাকে ফিরাইতে পারি না'। বলিয়া গোপনে কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।
>
> কিন্তু পালানো সহজ ব্যাপার নহে, হাতে পথ- খরচও সামান্য, সেইজন্য প্যারী গ্রামে হরিহর ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকটে গিয়া আশ্রয় লইল। বিবেচক ছেলেরা কহিল, 'বাবা, কেন বিপদ ঘরে আনিতেছেন'। হরিহর কহিলেন, 'বিপদ স্বয়ং আসিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তাহাকে ফিরাইতে পারি না'। গিরিশ বসু সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিল, 'ভট্টাচার্যমহাশয়, আপনি আমার ঝি ভাঙাইয়া আনিলেন কেন। ঘরে কাজের ভারি অসুবিধা হইতেছে'। ইহার উত্তরে হরিহর দু-চারটে সত্য কথা খুব শক্ত করিয়াই বলিলেন। তিনি মানী লোক ছিলেন, কাহারও খাতিরে কোন কথা ঘুরাইয়া বলিতে জানিতেন না। নায়েব মনে মনে উদগতপক্ষ পিপীলিকার সহিত তাঁহার তুলনা করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় খুব ঘটা করিয়া পায়ের ধূলা লইল। দুই-চারি দিনের মধ্যেই ভট্টাচার্যের বাড়িতে পুলিসের সমাগম হইল। গৃহিণীঠাকুরানীর বালিশের নীচে হইতে নায়েবের স্ত্রীর একজোড়া ইয়ারিং বাহির হইল। ঝি প্যারী চোর সাব্যস্ত হইয়া জেলে গেল। ভট্টাচার্জ মহাশয় দেশবিখ্যাত প্রতিপত্তির জোরে চোরেই-মাল রক্ষার অভিযোগ হইতে নিস্কৃতি পাইলেন। নায়েব পুনশ্চ ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া গেল। ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, হতভাগিনীকে আশ্রয় দেওয়াতেই প্যারীর সর্বনাশ ঘটিল। তাঁহার মনে শেল বিঁধিয়া রহিল। ছেলেরা কহিল, 'জমিজমা বেচিয়া কলিকাতায় যাওয়া যাক, এখানে বড়ো মুশকিল দেখিতেছি'। হরিহর কহিলেন, 'পৈতৃক ভিটা ছাড়িতে পারিব না, অদৃষ্টে থাকিলে বিপদ কোথায় না ঘটে?'
>
> ইতিমধ্যে নায়েব গ্রামে অতিমাত্রায় খাজনা বৃদ্ধির চেষ্টা করায় প্রজারা বিদ্রোহী হইল। হরিহরের সমস্ত ব্রহ্মোত্তর জমা, জমিদারের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নাই। নায়েব তাহার প্রভুকে জানাইল, হরিহরই প্রজাদিগকে প্রশয় দিয়া বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছে। জমিদার কহিলেন, 'যেমন করিয়া পার ভট্টাচার্যকে শাসন করো'। নায়েব ভট্টাচার্যের পদধূলি লইয়া কহিল, 'সামনেরে ওই জমিটা প্রগণার ভিটার মধ্যে পড়িতেছে; ওটা তো ছাড়িয়া দিতে হয়'। হরিহর কহিলেন, "সে কী কথা। ও যে আমার বহুকালের ব্রহ্মত্র'। হরিহরের গৃহপ্রাঙ্গণের সঙ্গলগ্ন পৈতৃক জমি জমিদারের পরগণায় অন্তর্গত বলিয়া নালিশ রুজু হইল। হরিহর বলিলেন, 'এ জমিটা তো তবে ছাড়িয়া দিতেও হয়, আমি তো বৃদ্ধ বয়সে আদালতে সাক্ষী দিতে পারিব না'। ছেলেরা বলিল, 'বাড়ির সংলগ্ন জমিটাই যদি ছাড়িয়া দিতে হয়, আমি তো বৃদ্ধ বয়সে আদালতে সাক্ষী দিতে পারিব না'। ছেলেরা বলিল, 'বাড়ির সংলগ্ন জমিটাই যদি ছাড়িয়া দিতে হয় তবে ভিটায় টিকিব কী করিয়া'।
>
> প্রাণাধিক পৈতৃক ভিটায় মায়ায় বৃদ্ধ কম্পিতপদে আদালতের সাক্ষ্যমঞ্চে গিয়া দাঁড়াইলেন। মুন্সেফ নবগোপালবাবু হাঁহার সাক্ষ্যি প্রামাণ্য করিয়া মকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া দিলেন। ভট্টাচার্যের খাস প্রজারা ইহা লইয়া গ্রামে ভারি উৎসবসমারোহ আরম্ভ করিয়া দিল। হরিহর তাড়াতাড়ি তাহাদিগকে থামাইয়া দিলেন। নায়েব আসিয়া পরম আড়ম্বরে ভট্টাচার্যের পদধূলি লিয়া গায়ে মাথায় মাখিল এবং আপিল রুজু করিল। উকিলরা হরিহরের নিকট হইতে টাকা লন না। তাঁহারা ব্রাহ্মণকে বারঙ্গবার আশ্বাস দিলেন, এ মকদ্দমায় হারিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। দিন কি কখনো রাত হইতে পারে। শুনিয়া হরিওহর নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে বসিয়া রহিলেন।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 28 - 39
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> একদিন জমিদারি কাছারিতে ঢাকঢোল বাজিয়া উঠিল, পাঁঠা কাটিয়া নায়েবের বাসায় কালীপূজা হইবে। ব্যাপারখানা কী। ভট্টাচার্য খবর পাইওলেন, আপিলে তাহার হার হইয়াছে। ভট্টাচার্য মাথা চাপড়াইয়া উকিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বসন্তবাবু, করিলেন কি। আমার কী দশা হইবে'।
> 'দিন যে কেমন করিয়া রাত হইল, বসন্তবাবু, করিলেন কী। আমার কী দশা হইবে'।
> দিন যে কেমন করিয়া রাত হইল, বসন্তবাবু তাহার নিগূঢ় বৃত্তান্ত বলিলেন, 'সম্প্রতি যিনি নতুন এডিশনাল জাজ হইয়া আসিয়াছেন তিনি মুন্সেফ থাকা কালে মুন্সেফ নবগোপালবাবুর সহিত তাঁহার ভারি খিটিমিটি বাধিয়াছিল। তখন কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই; আজ জজের আসনে বসিয়া নবগোপালবাবুর রায় পাইওবামাত্র উলটাইয়া দিতেছেন; আপনি হারিলেন সেইজন্য'। ব্যাকুল হরিহর কহিলেন, 'হাইকোর্টে ইহার কোনো আপিল নাই?' বসন্ত কহিলেন, 'জজবাবু আপিলে ফল স্নাইওবার সম্ভাবনা মাত্র রাখেন নাই। তিনি আপনাদের সাক্ষীকে সন্দেহ করিয়া বিরুদ্ধ পক্ষের সাক্ষীকেই বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন। হাইকোর্টে তো সাক্ষীর বিচার হইবে না'।
> বৃদ্ধ সাশ্রুনেত্রে কহিলেন, 'তবে আমার উপায়?'
> উকিল কহিলেন, 'উপায় কিছুই দেখি না'।
> গিরিশ বসু পরদিন লকজন সঙ্গে লইয়া ঘটা করিয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া গেল এবং বিদায়কালে উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাস কহিল, 'প্রভু, তোমারই ইচ্ছা।'"[১৭]

বাংলা ছোটগল্পের সার্থক রূপকার রবীন্দ্রনাথ বাংলা অণুগল্পকে তার সার্থক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অণুগল্পের পটভূমিটি নির্মাণ করেছিলেন। বাংলা অণুগল্প রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে যে পূর্ণতা পেয়েছিল তা পরবর্তীতে বনফুল (১৯শে জুলাই ১৮৯৯ – ৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ খ্রিঃ) তাকে আলাদা মাত্রা দান করেছিলেন। যদিও তার লেখা গল্পগুলিকে 'পোস্টকার্ড সাইজ গল্প' বলা হয়। এগুলো আদতে অণুগল্পই। তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথমদিককার সর্বাধিক অণুগল্পের শ্রষ্ঠা। তিনি কম-বেশি চারশত অণুগল্পের লেখক। তার লেখা 'বনফুলের গল্প' (১৯৩৬ খ্রিঃ), 'বাহুল্য' (১৯৪৩ খ্রিঃ), 'বিন্দু বিসর্গ' (১৯৪৪ খ্রিঃ), 'অদৃশ্যলোকে' (১৯৪৬ খ্রিঃ), 'আরো কয়েকটি' (১৯৪৭ খ্রিঃ), 'তন্বী' (১৯৪৯ খ্রিঃ), 'নবমঞ্জুরী' (১৯৫৪ খ্রিঃ), 'ঊর্মিমালা' (১৯৫৫ খ্রিঃ), 'রঙ্গনা' (১৯৫৬ খ্রিঃ), 'অনুগামিনী' (১৯৫৮ খ্রিঃ), 'করবী' (১৯৫৮ খ্রিঃ), 'সপ্তমী' (১৯৬০ খ্রিঃ), 'দূরবীণ' (১৯৬১ খ্রিঃ), 'মণিহারা' (১৯৬৩ খ্রিঃ), 'বনফুলের নতুন গল্প'(১৯৭৬ খ্রিঃ) ইত্যাদি সুদীর্ঘ গল্পের গ্রন্থগুলিতে ছড়িয়ে আছে অজস্র অণুগল্প। বনফুলের পর বাংলা অণুগল্পের জগতে নরেন্দ্রনাথ মিত্র (৩০শে জানুয়ারি ১৯১৬ খ্রিঃ – ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ খ্রিঃ) বেশ পাকাভাবে আসনটি গ্রহণ করেছিলেন। তবে সেই সময় অণুগল্প নামটি প্রচলিত ছিল না। যেমন ভাবে রবীন্দ্রনাথ কখনো বলছেন 'গল্পিকা', 'কথিকা'। লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্রও অণুগল্পকে বলতেন 'ক্ষুদ্রগল্প'। আবার 'অণু' অপেক্ষা 'বিন্দু' শব্দের ব্যবহারে তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে লেখকের পুত্র অভিজিৎ মিত্র জানিয়েছেন,

> "বিন্দু শব্দটির প্রতি বাবার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল। বইয়ের নাম রেখেছেন বিন্দু বিন্দু। একই নামের গল্প আছে কয়েকটি।"[১৮]

পিতার মৃত্যুর পর লেখকের গ্রন্থাকারে অসংকলিত অণুগল্পগুলিকে একত্রে করে তিনি প্রকাশ করেন 'বিন্দু বিন্দু' নামে। তার লিখিত অণুগল্পগুলি হল- 'দুই বন্ধু', 'দুটি গাছ', 'দ্বিধান্বিতা', 'একজন পৌঢ়', 'ভদ্রলোক', 'আকর্ষণ', 'দেহমন', 'ত্রিমূর্তি', 'প্রতীক্ষা', 'বন্ধু', 'ভেনাস', 'বাসিফুলের মালা', 'প্রোষিতভর্ত্তিকা', 'যৌবনদূতি', 'দত্তক', 'চাকর', 'পাগল', 'পরকীয়া', 'স্ট্রোক', 'মূক', 'প্রতিক্রিয়া', 'লাইব্রেরি', 'একজন প্রধান ভদ্রলোক', 'ছুটি', 'মুখোশ', 'ফটো', 'মালি', 'উর্ধ্বমুখী', 'একটি গল্পের খসড়া', ইত্যাদি। বাংলা অণুগল্প এই নামে অণুগল্পের চর্চা না করলেও অণুগল্পের ফল্গুধারাকে বাহিত করেছে তাদের এই সাহিত্য চর্চায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে নরেন্দ্রনাথ মিত্র এই মাঝের সময় কালের খ্যাতিমান লেখকদের মধ্যে শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরা অণুগল্প অপেক্ষা উপন্যাস লিখতেই স্বাচ্ছন্দ বোধ করতেন। শরৎচন্দ্রকে বাংলা বড়গল্পের উদ্গাতা বলা হয়। এই পর্বে অণুগল্প নিয়ে চর্চা করার মতো আগ্রহ কেও দেখায় নি। তবে অণুগল্পের ফল্গুস্রোতের প্রবহমানতা বন্ধ হয়নি। নরেন্দ্রনাথ মিত্রর পর স্বপ্নময় চক্রবর্তী অণুগল্পের সক্রিয় লেখক। তিনি প্রায় ১৯৭২-৭৩ সাল থেকেই অণুগল্প লিখেছেন। 'কোরক' পত্রিকায় তার অণুগল্পের লেখা ছাপা হত। তার বিখ্যাত কয়েকটি অণুগল্পের বই হল

- 'সোনাকথা রুপোকথা', 'এই আমি, এই তুমি', 'সম্পর্কের এমব্রোডারি' ইত্যাদি। পরবর্তীকালে অভিযান পাবলিশার্স থেকে 'অণুগল্প সংগ্রহ' নামে তার সমগ্র অণুগল্পের সংগ্রহ প্রকাশিত হয়।

তবে বাংলা অণুগল্পের জোয়ার আসতে শুরু করল যখন অণু পত্রিকা বাজারে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ল। ১৯৬৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর মাসে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় 'মিনিবুক' নামাঙ্কিত ক্ষুদ্র আয়তনের বই বাজারে এসে রীতিমত আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। ১৯৭০ খ্রিঃ-র জানুয়ারি মাসে বিশ্বের প্রথম অণুপত্রিকা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল 'পত্রাণু'। পত্রিকাটির মাপ ৪ ইঞ্চি ইন্টু ২ সমস্ত ভাগের ১ ইঞ্চি। 'পত্রাণু' প্রকাশের পরেই বেরোলো অসংখ্য মিনি পত্রিকা। যার মধ্যে - বায়ল্যাঙ্গুয়াল 'এক্স' পত্রিকা, নকশালদের 'স্ফুলিঙ্গ' পত্রিকাও আছে। এই সময় প্রায় ৪৫০ টি মিনি পত্রিকা বের হয়। এই পত্রিকাগুলিতে ভর করে বাংলা অণুগল্পের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট নির্মাণ হয়ে গেল পাকাপাকি ভাবে। 'পত্রাণু' সেই সময় অমিয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে প্রকাশ পেল। এই পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করতে লাগলেন বনফুল, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, মনোজ বসু, বিমল মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষ কুমার ঘোষ ইত্যাদি স্বনামধন্য লেখকেরা। তবে এক্ষেত্রে বলে নেওয়া ভাল যে এরা সাহিত্যের স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বনামধন্য ও প্রতিষ্ঠিত লেখক। এতদিন পর্যন্ত অণুগল্পের জন্য নির্দিষ্ট কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। অণুগল্পকে প্রকাশ করার জন্য কোন পত্রিকা এগিয়েও আসেনি। অণুগল্প এই সময় লেখবার পশ্চাতে অবশ্য আরো অন্য একটি কারণ ছিল। কারণ এই সময়টা প্রতিষ্ঠান বিরোধের সময়কাল। কিছুটা আগে বাংলা কবিতা 'হাংরি জেনারেশন'-এর কবিদের দ্বারা ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত হয়। এই আন্দোলন ছিল প্রথানুগ প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ফসল। এই সময় বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকার জগতে একধরণের প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রাসন চলছিল। পত্রিকা হাউসগুলির অভিমত ছিল যেন তারা লেখকের জন্মদাতা। সন্দীপ দত্ত এই বিষয়ে জানিয়েছেন-

> "আসলে প্রতিষ্ঠানের হাউসজার্নালগুলো ভাবত আমরাই লেখক প্রোডাক্ট করছি। আমরা যাকে পুরস্কার দেব সেই লেখক।"[১৯]

তাই লিটিল ম্যাগাজিনও এই সময় নতুন ভাবে প্রকাশ করল স্বতন্ত্র আঙ্গিকে। কারণ তাদের নিজস্ব কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না কিন্তু প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার কাজ করত। বাংলা অণুগল্প এই লিটিলম্যাগাজিনের হাত ধরেই ব্যাপক ভাবে সম্প্রসারিত হল। এই সময় 'পত্রাণু'র পাশাপাশি সত্তরের দশকে 'শ্রী', 'ঋতম', 'কুহু', 'চন্দ্রবিন্দু', 'মাইক্রো', 'মিনিষ্টার', 'এক্স' ইত্যাদি পত্রিকায় অণুগল্প ও অণুজাতীয় সাহিত্য রচিত হতে থাকল। অণুগল্পের প্রসারণের জন্য 'পত্রাণু'-র পক্ষ থেকে অণুগল্পের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল।

> "পত্রাণু-র পক্ষ থেকে অণু-গল্প প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। গল্প ২৫০ টি শব্দের মধ্যে রচিত হওয়া বাঞ্চনীয়। শ্রেষ্ঠ গল্পের জন্যে ২০ টাকা মূল্যের বই পুরস্কার দেওয়া হবে। লেখা পাঠানোর শেষ দিনঃ ১৫ই জানুয়ারি' ৭১। খামের উপর লিখতে হবে- 'অণু-গল্প প্রতিযোগিতা'। সম্পাদক/পত্রাণু, ১২২এ, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স, কলিকাতা-১৯।"[২০]

অর্থাৎ অণুগল্পের চর্চাকে আরো আগ্রহের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য সম্পাদকদ্বয় এই ধরণের প্রতিযোগিতার আয়োজনও করতেন। অণুগল্পকে সর্বজন লেখক ও পাঠকের নিকট পৌঁছাতে এদের ভূমিকা অক্ষয় হয়ে থাকবে। বাংলা অণুগল্পের প্রথম দিককার উৎসাহী সম্পাদকদের মধ্যে অমিয় চট্টোপাধ্যায়ের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

লিটিল ম্যাগাজিন আসার পর বাংলা অণুগল্পের পথচলা মসৃণ হয়েছিল। পত্রিকাগুলির আগ্রহের জায়গা ছিল অণুগল্পকে নিয়ে। তাই এই সময় অণুগল্প চর্চার স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। এই ভাবে ধীরে ধীরে বাংলা অণুগল্পের প্রারম্ভিক পর্বের পথচলা শুরু হয়।

Reference:

১. তেজসানন্দ, স্বামী (সংকলক), প্রার্থনা ও সঙ্গীত, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ, হাওড়া, একবিংশ সংস্করণ ২০১৩, ১৩ই মার্চ, পৃ. ১

২. তদেব, পৃ. ২

৩. বড়ুয়া, বিপ্রদাশ, পঞ্চতন্ত্র গল্পসংগ্রহ, সাহিত্য প্রকাশ, ৮৭, পুরানো পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০, তৃতীয় মুদ্রণ,

মাঘ ১৪২২, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৮০-৮১

৪. ভট্টাচার্য, সুখেন্দ্র ও মাইতি প্রগতি সম্পাদিত, বাংলা সাহিত্যের বাছাই করা অণুগল্প ১০০, ইসক্রা, বাদামতলা রোড, কলিকাতা- ৫৮, কলকাতা বইমেলা জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ১৭

৫. শর্মা, শ্রীঈশ্বর চন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচনা সমগ্র, কলকাতা বইমেলা, ২০১০, প্রকাশক, স্বপন বসাক, বসাক বুক স্টোর প্রাইভেট লিমিটেড, ৪, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ১০৬৬

৬. তদেব, পৃ. ৯৪৬

৭. তদেব, পৃ. ৯৪৭

৮. দাশ, শিশিরকুমার, বাংলা ছোটগল্প, দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিমচ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৬, পৃ. ২০

৯. তদেব, পৃ. ২০

১০. তদেব, পৃ. ২১

১১. তদেব, পৃ. ৬৭

১২. মুখার্জি, প্রীতি, শতক সেরা অণুগল্প, ধ্রুপদী, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কল-৭৩, প্রকাশকাল, ডিসেম্বর ১৯৫৯, পৃ. ১৬-১৭

১৩. ঘোষ, তপোব্রত, রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিমচ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ, মে ২০১২, পৃ. ৩৪৩

১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছিন্নপত্রাবলী, বিশ্বভারতি গ্রন্থন বিভাগ, পুনর্মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪১১, পৃ. ১৮৮

১৫. রায়, চৌধুরী গোপিকানাথ, রবীন্দ্রনাথ : ছোটগল্পের প্রকরণ শিল্প, সাহিত্য লোক, ২১, অভেদানন্দ রোড, মাণিকতলা, আজাদহিন্দ বাগ, কল-৬, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ৭

১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছিন্নপত্রাবলী, বিশ্বভারতি গ্রন্থন বিভাগ, পুনর্মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪১১, পৃ. ১৬২

১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৪২৬, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কল-১৭, পৃ. ৩৭৮-৩৭৯

১৮. মিত্র, অভিজিৎ, (সংকলক ও সম্পাদক) বিন্দু বিন্দু নরেন্দ্রনাথ মিত্র, কৃতি প্রকাশনী, কল-৪, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৬

১৯. দত্ত, সন্দীপ, লিটিল ম্যাগাজিন স্বতন্ত্র অভিযাত্রা, আত্মজা পাবলিশার্স, বসন্ত কুসুম, আড়িয়াদহ, কল-৫৭, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯, পৃ. ৩৩

২০. চট্টোপাধ্যায়, অমিয় ও মুখোপাধ্যায় আশীষতরু, পত্রাণু, বর্ষপূর্তি সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৭১, ১২২এ, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স, কল-১৯, পৃ. ২

Bibliography:

ঘোষ চন্দন, অণু-সন্ধান, অভিযান পাবলিশার্স, ১০/২এ, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কল-৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৯

দাশ শিশিরকুমার, বাংলা ছোটগল্প, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিমচ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৬, অগ্রহায়ণ ১৪২৩

দত্ত সন্দীপ, লিটল ম্যাগাজিন স্বতন্ত্র অভিযাত্রা, আত্মজা পাবলিশার্স, বসন্ত কুসুম, আড়িয়াদহ, কল-৫৭, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১৯

বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কল-৭৩, নতুন পুনর্বিন্যাস সংস্করণ, ২০১৬-২০১৭

হোসেন বিলাল, অণুগল্পের অস্তিত্ব আছে, অনুপ্রাণন প্রকাশন, বি-৬৪ ও বি-৫৩ কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০১৬

চট্টোপাধ্যায় ব্রজ সৌরভ, অণুগল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও স্বপ্নময় চক্রবর্তী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ, রথযাত্রা, ২০১৮